...From Part 2...

সুলেমান নিবারণের টি স্টলে আড্ডা দিতে লাগল। উদ্দেশ্য আকবর আলীর সাথে ভাব করা। আকবর আলীর দাম অনেক বেড়ে গেল তার কাছে। সাথে নিয়ে যায় লতিফকে। স্কুল ছুটি হবার পরই চলে যায় দুজনে। যতক্ষন পারে আড্ডা দেয়। তারপর ঘরে ফেরে।

কয়েকদিন পরই বলল, কইসলামনি? বাইর কইরা ছারমু? লইত্যা (লতিফ) বিয়া করেছে। লজিং মাস্টারের মেয়েকে মানে তার ছাত্রীকে। ঢাকাইয়া কুট্টি। কুট্টি নামক কোন শব্দের সাথে আমাদের তখনও কোন পরিচয় নেই। তবে বুঝতে পারলাম শব্দটা এক রকম মানুষের দল বা গোষ্টিকে বুঝায়। সে গোষ্টিতে বিয়ে করলে বড় ভাই বা আত্নীয়রা মেনে নেয়না। আমার মনে হল কথাটা রিফিউজির চেয়েও খারাপ।

সুলেমান বলল, বিয়া করছিল, তাও মাইনা নিত। বিয়ার পর লইত্যা স্কুলেই যায়না। সব সময় ঘরে থাকে। দুই বছর ধইরা ডাইল মারতেছে। তাই তার ভাই এইখানে পাঠাইয়া দিছে। আর লইত্যা কয়, পইড়া আর কি অইব? পাশ তো আমি করতে পারুম না জানি। শ্বশুরে কইছে একটা দোকান লেইখ্যা দিব। পাঁচটা দোকান আছে। সবচেয়ে বড়টাই দিব কইছে। তারপর আর লেখাপড়ার দরকারটা কি? তবু ভাইএর মনের দিকে তাকাইয়া আইতে অইল। আর একটা চেষ্টা কইরা দেখি।

লতিফের গুমর ফাঁস করে আকবর আলীর পেছনে লাগল সুলেমান। তার ইচ্ছে ছিল আকবর আলীকে চা পানি খাইয়ে ভাব করে নেবে। চেষ্টাও করেছে। অনেক দিন পর কদম গাছটার নীচে বসে তার এতদিনের চেষ্টার ফলাফল বলতে লাগল।

বলল, আকবর আলী লোকটা যেই সেই নয়। আলাপ না করলে কিছুই বোঝা যায়না। আমি যাই চা খাওয়াইয়া একটু ভাব করব, আর সে উল্টা খাওয়াইয়া দেয়। কোনদিন চায়ের পয়সা দিতে পারিনাই। আলাপ কইরা অনেক কিছুই জানলাম। তাঁর এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। শিবপুর থাইকা পাশ করেছে। এখন ওয়াপদায় চাকরি করে। আর এক ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে অর্থনীতিতে। আকবর আলী নিজে বি,এ পাশ। সেই ১৯৩৫ সালে। ইন্ডিয়া সরকারের একজন অফিসার ছিলেন। আমি যে আশায় ভাব করতে চাইলাম, এসব কথা শুইনা কাইট্টা পড়লাম। মেট্রিকটা যদি পাশ করতাম তাও একটা কথা ছিল। রিফিউজি হোক আর যাই হোক, একটা সামান্য কিছু না থাকলে কি নিয়া দাঁড়ান যায়। তাই আর চা খাইতেও যামুনা, খাওয়াইতেও না। কপালে নাই, কি আর করা! তবে শ্যামলী যদিও রিফিউজি কিন্তু তার উপযুক্ত পাত্র এই স্কুলে কেউ নেই। আকবর আলীর পরিবারের মত শিক্ষিত পরিবার এখানে নেই। তাই শ্যামলীরা এখানকার মানুষের সাথে মিশতে পারবে না।

-দশ-

পাড়ার নাজু, বাচ্চু ওরা কালোবাজারি করে। আমার খেলার সাথী। তাদের কাছে অনেক গল্প শুনি। সেখেরকোটের বাজার, মতিনগর, নিছুমপুর, বক্সনগর চতল। শেখেরকোটের বাজারে অনেক জিনিষ সস্তা। শীতের দিনে কমলা। যে কমলার গন্ধ বহুদূর থেকে পাওয়া যায়। ওরা এপার থেকে ডিম, মাছ, তরি তরকারি নিয়ে যায়। ওপার থেকে নিয়ে আসে আক্তার বিড়ি, কাপড় ইত্যাদি। ওরা সব পথঘাট চিনে। আগরতলা যায় আবার দিনে দিনে ফিরে আসে। ওদের স্কুলে যেতে হয়না। হাত পাততে হয়না। কি মজা তাদের! তবে মাঝে মাঝে তাদেরও অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। একবার নাজুরা ই,পি,আর-কে রফা দেয়নি। তাই ইপি আর তাদেরকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল। দৌড়ে পালাবার

সময় নাজুর ডিমের ঝাঁকি মাথা থেকে পড়ে যায়। আর সব ডিম ভেঙ্গে একাকার। তখন নজুর পুঁজি প্রায় শেষ। ইচ্ছে হয় একবার গিয়ে সেসব জায়গাগুলো দেখি। কিন্তু বাজেটের অভাব। যার জন্য রানুর সাথে দেখা করার পরিকল্পনাও আপাততঃ বাতিল করা আছে।

আমাদের বাড়ীর দক্ষিনে পুকুর। পুকুরের দক্ষিনে সিনাই নদী। তারপর বহুদূর মাঠ। মাঠের পর মধুপুরের মুড়া। পুকুরের দক্ষিন পাড়ে দুটা বড় বড় আমগাছ। এপার ওপার আসা যাওয়ার পথও এই পুকুর পাড় দিয়ে। আম গাছের নীচে সব সময়ই মানুষ থাকে। গ্রামের অনেকেরই বিশ্রামের স্থান এটা। কোথায়ও বাতাস নেই, এই আমগাছের নীচে আছে। তাই যাদের কোন কাজ নেই তারা এই আমগাছের নীচে বসে থাকে বা বাড়ী থেকে মাদুর নিয়ে আসে। সারাদিন শুয়ে শুয়ে আরাম করে। এই পথ দিয়ে প্রায়ই জায়েদকে দেখি আসাযাওয়া করতে। জিজ্ঞেস করি, কোথায় গেছিলে? উত্তর দেয়, বর্ডারে। পরে আর জিজ্ঞেস করতাম না। বুঝতাম বর্ডার থেকে আসছে অথবা যাচ্ছে। এই তার ব্যবসা।

মতিনগর গ্রামটা অর্ধেক এপার বাংলায়, অর্ধেক ওপার বাংলায়। জায়েদের আড়ত মতিনগর নিতাইর বাড়ী। ও বাড়ীতেই সে এপার ওপার করে। বেশীরভাগ সময় নিতাইর বাড়ীতে কাটায়। জায়েদ এখন বড় কারবারি। নিজে হাতে কিছু নেয়না। লোক দিয়ে আনা নেয়া করে। বড় কারবারিরা মজুর দিয়েই আনা নেয়া করে। তারা দূরে থাকে। ধরা পড়ার ভয় নেই।

নিতাই বেলেক করেনা। কমিশন খায়। এ কমিশন সে কমিশন নয়। কোন ধরা বাঁধা কমিশন নেই। নিতাইর বাড়ী একটা এক্সেচেইঞ্জ সেন্টার। ওপারের বেলেইক্কা তার বাড়ীতে মাল রেখে যায়, এপারের বেলেইক্কা মাল নিয়ে আসে, আবার নিজেরটা দিয়ে আসে। তারা জানে কখন কোন মাল পরতায় এবং বাট্টায় মিলবে। বাট্টা মানে এপার ওপারের টাকার মূল্যমান। এ বাংলার টাকার দাম বেশি, ও বাংলার দাম কম। এ বাংলার এক টাকা দিলে ও বাংলায় এক টাকা চার আনা হয়। এ হিসেব ঠিক রেখে, কোন্ মালের দাম কখন উঠানামা করছে সব দেখেই নিতাইর বাড়ীতে মাল রাখা হয়। এই স্টক রাখার জন্য নিতাইকে দু দিক থেকেই একটা অংক ধরে দেয়া হয়। কম বেশি নির্ভর করে মালের লাভের উপর। তবে নিতাইর স্ত্রী মালতির ভাগে সব সময়ই পড়ে। সে লাভ হোক বা না হোক।

মালতির বয়স সতের আঠার। নিতাইর বয়স প্রায় চল্লিশ। মালতির বাবা গরীব বলে কোন সুপাত্রের হাতে মালতিকে দিতে পারেনি। অনেক চেষ্টার পর এই ভূমিহীন নিতাইকে পেয়েছে। নিতাই আগে থাকত শেখেরকোটের সুকুমার বাবুর বাড়ীতে। বছরমুনি (মুনি মানে কামলা, প্রতি বছরের জন্য চুক্তি)। থাকত বাড়ীর বাইরে ছোট একটা ছনের ঘরে। সেটা শুধু মুনিদের জন্যই তৈরী। সুকুমার বাবুই এই বিয়ের ঘটকালি করেন। বিয়ে দিয়ে এই মুনি ঘরেই থাকতে দেন নিতাইকে।

যেদিন মালতিকে নিয়ে ঘরে ঢুকল সেদিন থেকেই ঝামেলা শুরু হল। সুকুমার বাবুর একমাত্র ছেলে কুমুদ হাই স্কুলে পড়ে। বয়স মালতির কাছাকাছিই হবে হয়ত। মালতি আসার পর সে আর স্কুলে যায়না। আদরের ছেলে বলে তার বাবা মাও স্কুলে যেতে বলেনা। কুমুদ এখন দিনরাত মালতির ধারে কাছে থাকে। ঘুর ঘুর করে। ওদিকে নিতাই ব্যস্ত থাকে সুকুমার বাবুর কি লাগবে তা নিয়ে, আর এদিকে কুমুদ ব্যস্ত থাকে মালতির কি লাগবে তা নিয়ে। মালতির দেখাশুনার ভার যেন কুমুদের। যখনই সময় পায় তখনই নিতাই একবার ঘরে যায়। দেখে কুমুদ বসে আছে। ঘর ছাড়েনা। নিতাই বাড়ীর চাকর। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। মালতির সাথে নিরালায় একটু কথা বলবে সে সুযোগও নেই। অতিষ্ট হয়ে একদিন কুমুদের মাকে বলেছিল। বলেছিল, ছোটবাবু সব সময় ঘরে থাকে বলে মালতি একটু

বিশ্রাম নিতে পারেনা। মাঝে মাঝে একটু বিশ্রামের সুযোগ দিতে বলুন।

শুনে কুমুদের মা বললেন, ও তো বাচ্চা ছেলে। ওকে আবার লজ্জা কি? তাছাড়া ওর কোন দিদি নেই। তাই মনে করে দিদির মত।

এ প্রবোধ বাক্যে নিতাইর মন ভরেনি। সে চায় মালতিকে প্রতি মুহূর্তে একা পেতে। চল্লিশ বছরের বুভুক্ষ জীবটাকে কানয় কানয় ভরে দিতে চায়। ভালবাসায়, আদরে সোহাগে আর ভোগে। কাজের ফাঁকে যখনই একটু অবসর পায় তখনই চলে আসে মালতির কাছে। আর দেখতে পায় কুমুদ বসে আছে। হাসি আনন্দে তাদের সময় কাটে। হেসে কুটি কুটি যায়। নিতাইকে দেখলেই মালতি গম্ভীর হয়ে যয়। কুমুদ অপ্রস্তুত হয়ে যায়। নিতাইর হিংসে হয় কুমুদের উপর। রাগ হয় মালতির উপর। সেই বা কেন এত আস্কারা দেয়! আস্কারা পায় বলেই তো আঠার মত লেগে থাকে।

একদিন দুপুরে হঠাৎ করে ঘরে গিয়ে দেখে কি কথা নিয়ে দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কুমুদকে দেখলে মালতিও যেন খুশীতে ডগবগ করে। নিতাইকে দেখেই দুজনে চুপ। আর একদিন কাজ সেরে ঘরে ফিরে দেখে মালতি ঘরে নেই। নিতাইর ভেতরটা একবারে ছ্যাৎ করে উঠল। বাইরে এসে দেখে ওরা দুজনে অদূরে কাঁঠাল গাছটার নীচে খুব কাছাকাছি দাড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছে। সূর্যাস্তের লাল আভা আকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে। অন্ধকার গ্রাস করার আগে যেন একবার এঁকে দিতে চায় সিদুঁর চিহ্ন। মালতির মুখে সে আভা প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। মনে হল এ মালতি সে মালতি নয়, কোন এক কল্পলোকের মালতি।

নিতাই গিয়ে পাশে দাঁড়াতেই দুজনে সরে দাঁড়াল। তারপর চুপচাপ ঘরের দিকে রওয়ানা দিল।

মালতির কোন্ কোন্ প্রয়োজন কুমুদ মিটায় তা জানেনা নিতাই। কিন্তু যেদিন দেখল সুকুমার বাবুর ঘরের চাল,ডাল, নুন, তেল সব এসে মালতির ঘর ভরে গেছে, সেদিনই নিতাই স্থির করল একটা কিছু করতে হবে। মালতিকে জিজ্ঞেস করল, এসব কোথা থেকে এল?

কুমুদ নিয়ে এসেছে।

নিয়ে এসেছে, আর তুমি রাখলে? বড়বাবু বা বড়মা জানে?

কি জানি, জানে কিনা। তবে সাধা জিনিষ আধা লাভ। আমি তো বলিনাই আনতে।

তারপর আর কথা বাড়ায়নি নিতাই। মনে মনে পথ খুঁজতে লাগল। যেভাবেই হোক ব্যবস্থা একটা করতে হবে। এখান থেকে চলে যেতে হবে।

মতিনগরের কুন্দসই তাকে দিয়েছে এই জায়গাটুকু। মতিনগর গ্রামের বাইরে পায়ে চলা প্রধান পথের উপর একটা মুদির দোকান। বাঁশ ওছন দিয়ে তৈরী। এই দোকানে এপার ওপারের সব জিনিষ আছে। ধারে কাছে কোন বাড়ীঘর নেই। কোন ক্রেতা নেই। এ দোকান শুধু বেলেইক্কাদের জন্য। দিনরাত খোলা থাকে। রাতেই বিক্রি হয় বেশি। কোন সময় দেখা যায় এক রাতেই সব জিনিষ বিক্রি হয়ে গেছে। বড় ধ্বনের পার্টি আসলে এমন হয়। এই দোকানের পেছনে শ'দুয়েক গজ ভেতরে। এ জায়গা কোন কাজে লাগবেনা কোনদিন। ঝোপঝাড়, কাটাবন। শেয়ালের গর্ত।

বন্য লতা ভর্তি। নিতাই ঘর করে থাকতে পারে যতদিন ইচ্ছে। নিতাই বাঁশ-ছন দিয়ে একটা ছোট কুঁড়েঘর তৈরী করে দোকানের পাশ দিয়ে, ঝোপের ভেতর দিয়ে একটা সরু পথ করে নিয়েছে। ঘরের চারদিকে ঝোপঝাড়ে ভর্তি। বেলেইক্কাদের জন্য সম্পুর্ন নিরাপদ আশ্রয়। দেখলে মনে হয় যেন কোন সাধু-দরবেশের আস্তানা। এখন নিতাইর পূঁজি মালতি। এদিকের বেলেইক্কারা প্রায় সবাই এখন নিতাইর বাড়ীতে মাল রাখে। বিনা টাকায়, মালতি-পূঁজিতে ব্যবসা করছে নিতাই।

মালতির ব্যবহার অমায়িক। তার হাসিটি যে একবার দেখেছে সে আবার যাবেই মাল রাখতে। লাভ হোক বা না হোক মালতির হাতে কিছু না কিছু টাকা যাবেই। মালতির হাতের চা খাওয়ার জন্য অনেকেই বিশ পঁচিশ টাকা খরচ করে নিয়ে আসে এটা সেটা। যখন তখন মালতির জন্য উপহার আসে যার তার হাত থেকে। কারও্র লাভ বেশি হলে সে উৎসব হয় মালতির বাড়ীতে। যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি জিনিষ কেনা হয়। নিতাইর বাড়ি এখন বেলেইক্কাদের মুখে মুখে। মালতি সকলের পরিচিত নাম।

-এগার-

রফিক বলল, আমি, ননী, অমিয় আগরতলা যাব 'দীপ জ্বেলে যাই' দেখতে। যাবি নাকি ফজলু?

প্রস্তাব শুনে মনটা নেচে উঠল খুশিতে। কোনদিন ইন্ডিয়ায় যাইনি। অথচ কত গল্প শুনি!

বললাম বাজেটের অভাব। তাই ইচ্ছে থাকা সত্বেও যেতে পারবনা।

তুই একটা হাবা। বাজেটের আবার অভাব কি? ঘরে পাট নাই?

পাট থাকলে কি হবে?

তুই নিয়ে আয় এক গাদা। আমি বেচে দিব। দেখবি বাজেট কত হয়।

তাইত! এত সোজা ব্যাপারটা মাথায় আসেনি। জিজ্ঞেস করলাম, তুই কেমন করে করলি?

ওইতো! একটা বস্তা বেঁচে দিয়েছি।

তুই না লজিং থাকিস? লজিং মাস্টারের পাট বিক্রি করে দিলি?

এসব কাজে পাট বিক্রি করলে বা চুরি করলে কিছু হয়না। যা নিয়ে আয় এক বস্তা। দিনে না পারিস, রাতে নিয়ে আয়। আর যদি তাও না পারিস তাহলে তোদের পুকুর পাড়ে সন্ধার পর একজন আসবে, তার কাছে দিয়ে দিস।

পরদিন বাজেট হয়ে গেল। খুশি মনে রওয়ানা দিলাম আগরতলা। এই প্রথম আমি হিন্দুস্তানে যাব। যার এত এত গল্প

শুনেছি। আমরা চারজন। স্কুল চারদিন বন্ধ। কথা হল অমিয়র পিসির বাড়ীতে রাতে থাকব।

আমরা সকাল দশটা সময় রওয়ানা দিলাম। আজ বর্ডার পেরিয়ে ইন্ডিয়ায় যাব। যে বর্ডারের এত কথা শুনি। কথায় কথায় বর্ডার, যেখানে সেখানে বর্ডারের কথা হয়। কেউ কারো খোঁজ করলে উত্তর আসে এখন নেই, বর্ডারে গেছে। একটা জিনিষ বিক্রি করবে - কোথায় নিয়ে যাব? বর্ডারে। কেউ অনেক মাছ ধরেছে - নিয়ে যাবে বর্ডারে। ওখানে অনেক দামে বিক্রি হয় সব জিনিষ। তাই আমার কাছে বর্ডারটা একটা গুরত্বপূর্ণ জায়গা। সেই কল্পনার বর্ডার পেরিয়ে আজ আগরতলা যাব। সেও আর এক কল্পরাজ্য আমার কাছে।

ধজনগর পৌছেই অমিয় বলল, আমরা বর্ডারে এসে গেছি। সামনেই ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সীমানা। জিজ্ঞেস করলাম, বর্ডারে যে এত লোক আসে তারা কোথায় যায় বা কোথায় থাকে। তাদের কি নির্দিষ্ট জায়গা আছে? অমিয় বলল, মনে কর এসব প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি ঘর এক একটা দোকান। খুঁজলে সব বাড়ীতেই ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মাল পাবি। ওরা বর্ডারে আসে মানে তাদের জানাশুনা কোন বাড়ীতে আসে। যার যার প্রয়োজনে মাল কেনা বেচা হয়। বর্ডার মানে এই।

আর একটু এগিয়ে বরচতল গ্রাম। এসব জায়গা অমিয়র চেনা। প্রায়ই সে তার পিসির বাড়ী, মাসির বাড়ী বেড়াতে যায়। পাহাড়ি এলাকা। উচুঁ নীচু - একটু পাহাড়, আবার সমতল। বড় বড় গাছের তলা দিয়ে মেঠো পথ। লাল মাটির। আর একটু যাবার পর বা দিকে গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি বহুদূর পর্যন্ত বিল। পদ্ম বিছিয়ে আছে। আমি থমকে গেলাম। পদ্মবিলের পর আবার পাহাড়। যেন একটা ছবি। অমিয় বলল, কি রে পেছনে পড়ে গেলি কেন। এই যে পিলারটা দেখছিস, এইটাই ইন্ডিয়া পাকিস্তানের বর্ডার। এইটাই সীমানা। এই এখন আমরা ইন্ডিয়ায় পৌঁছে গেলাম।

দেখলাম সামনের বাড়ীটার মাঝামাঝি বরাবর একটা পিলার। একটা ঘর ইন্ডিয়ায়, আর একটা ঘর পাকিস্তানে।

এই বাড়ীর মানুষগুলো কি পাকিস্তানী না ইন্ডিয়ান?

রফিক বলল, এরা দুদিকেরই। যেদিকে সুবিধা দেখে সেদিকেই যায়। তাদেরকে কেউ বাধা দিতে পারেনা। এপারেও না ওপারেও না। এরকম অনেক বাড়ী আছে। তারা যেমন ছিল তেমনি আছে।

রাঙ্গামাটির পথ ধরে একটু এগিয়ে একটা চওড়া মেঠো পথে উঠলাম। পাহাড়ের উপর হলেও সমতল। বহুদূর পর্যন্ত আম কাঁঠালের বাগান। অমিয় বলল, এটা মতিনগর। এটাই কালোবাজারিদের পথ। মালামাল এপার ওপার করে। দেখলাম এপার ওপারের সবকিছুই এক। আলাদা করার মত কিছুই নেই। দেখতে দেখতে আমরা শেখেরকোট বাজারে চলে এলাম। যে শেখেরকোট বাজারের এত নাম শুনেছি সেখানে এসে দেখলাম এর নতুনত্ব কিছু নেই। আমাদের চন্ডিদ্বারের বাজারের মতই। সেখান থেকেই বাসে উঠে আগরতলা পৌছলাম।

বিকেলে চা খেয়ে আমরা কামান চৌমুহনীতে একটু ঘুরতে যাব। অমিয়র পিসিকে বলে যেই বের হয়েছি দেখি রাজনগরের প্রভাত। আরে তুই কবে এলি? তোরও কি আত্নীয় আছে এখানে?

না, আমরা তো গতবছরই চলে এসেছি। বিনিময় করে।

তখন আমার মনে পড়ল প্রভাতকে তো অনেকদিন যাবৎ স্কুলে দেখিনা। তাইত!

প্রভাত বলল, সবিতারা তো আমাদের দুটো বাড়ী পরেই। ওরা তো এসেছে আমাদের অনেক আগে।

তখন আমার সবিতার কথা মনে পড়ল। বেচারি ভুলে একটা কথা বলে ফেলেছিল বলে আর স্কুলেই যেতে পারলনা! তখন আমরা পঞ্চম শ্রেনীতে। পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেছে। সবিতা আর গীতা দুবোন। দেখতে অবিকল এক। কিন্তু যমজ নয়। কে বড় কে ছোট বোঝা যেত না। একদিন কি নিয়ে ক্লাশে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ সবিতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'হেডা মাস্টার' বাকীটা বলতে পারেনি। কয়েকটা দামড়া সাইজের ছাত্র চিৎকার হৈ চৈ করে উঠল। হেড মাস্টার বলতে গিয়েই এই বিপত্তি হল। তাদের টিটকিরিতে সেদিন সবিতা চোখের পানি ফেলে বাড়ী ফিরেছিল। পরদিন স্কুলে যাবার পরই আবার শুরু হয়েছিল সেই শব্দ উচ্চারণ। সেদিনই শেষ। তারপর আর সবিতাকে দেখিনি। কিছুদিন পর গীতাকেও আর দেখা যায়নি। ওদের কথা কেউ খেয়াল করিনি। পার্বতীর মত তাদেরও হয়ত বিয়ে হয়ে গেছে ভেবেছি। কিন্তু এরা যে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছে তা ভাবেনি কেউ। রইল শুধু রানু, শেফালি আর হাজেরা। ষষ্ঠ শ্রেনীর পর শেফালি আর হাজেরাও হারিয়ে গেল।

অমিয় বলল, তুই জানিস না? আরও অনেকে চলে এসেছে। মজলিশপুরের অবিনাশকে মনে আছে? ওই উত্তর পাড়ায় থাকে ওরা। দু বছর আগে এসেছে। আমি ভাবতে চেস্টা করলাম। যেসব হিন্দু বন্ধুদের দেখিনা, হঠাৎ করে যারা স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয় তারা পাকিস্তান ছেড়ে দেয়। আর বেশির ভাগ মানুষ তো আগরতলার দিকেই এসেছে মনে হয়।

অমিয়কে বললাম, চল সবিতাদের দেখে আসি।

সবিতাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখি সবিতার বাবা কোথায় যেন যাচ্ছে। অমিয়কে দেখে তিনি আগে আত্মীয়স্বজনের খবর নিলেন। তাঁকে দূর থেকেই দেখেছি। কোনদিন কথা হয়নি। আজ তিনি হাসিমুখে বললেন, বেড়াতে এসেছ? যাও, ভিতরে গিয়ে বস। আমি কাজে যাচ্ছি।

আমরা বাইরের ঘরে বসলাম। অমিয় বাড়ীর ভেতরে গেল। যাওয়ার ভাবটা দেখে মনে হল সে এ বাড়ীরই একজন। ঘরটা বেশ বড়। একপাশে একটা চৌকি। কোন বিছানা নেই। একটা বালিশ রয়েছে। অন্য পাশে একটা টেবিল, তার উপর একটা পেতলের কুপি। সামনের দিকে একটা হাতলওয়ালা চেয়ার। আমি চেয়ারটায় বসলাম। নুরু আর রফিক বসল চৌকির উপর। একটু পরেই অমিয়র সাথে গীতা এল। অমিয়র হাতে পানির জগ আর গীতার হাতে গ্লাস আর একটা পেতলের বাটিতে মুড়ি। টেবিলটার উপর রেখে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ তোমরা?

আমি গীতার দিকে তাকিয়ে আছি। এযে একবারে মহিলা হয়ে গেছে! আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছে। মনে হয় যেন বয়স অনেক। একটা মুরুব্বি মুরুব্বি ভাব। জিজ্ঞেস করলাম সবিতা কই?

ও আসবেনা, লজ্জা পাচ্ছে।

কিসের লজ্জা?

সেই লজ্জা!

এখনও সেই লজ্জা ভোলেনি? আমরা তো ভুলে গেছি।

কিন্তু সে ভোলেনি।

তুমি এবার কোন ক্লাশে?

আমি আর স্কুলে যাইনা। এখানে আসার পর স্কুলে ভর্তিই হইনি।

সবিতা যায়?

হ্যা, ও এবার অস্টম শ্রেণীতে।

চা মুড়ি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা রওয়ানা দিলাম। সামনেই দেখি কানু কাকা দাঁড়িয়ে। হা করে তাকিয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কবে এলে? কয়দিন আগেও তো তোমাকে দেখলাম চন্ডিদ্বার বাজারে লাউ বিক্রি করতে!

এইতো, মাসখানেক হল। তোরা বুঝি বেড়াতে এসেছিস? তোর বাবা কেমন আছেন?

আমি ভাবতে লাগলাম ব্যাপারটা কি? সবাই চলে আসছে। এবং চুপি চুপি। কেউ কাউকে বলে কয়ে আসেনা। সবাই এদিকে আসছে। সারদাবাবুর উপর খুব রাগ হল। আগরতলায় না এসে তিনি কেন কলকাতায় গেলেন?

-বার-

আগরতলা থেকে বিকেলে ফিরে দেখি গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নিশান নিয়ে প্রস্তুত। পাটশুলার মাথায় লাল নীল হলুদ কাগজের তেকোনা নিশান হাতে টুপি মাথায় রেল স্টেশনে যাবে। আজ পীরছাব হুজুর আসবেন। গত দু মাস যাবৎ হুজুর এখানে পদার্পন করতে পারেননি। তাঁর মুরিদের অনেক আপদ বিপদ যাচ্ছে। তিনি না আসলে কোন কিছুরই সুরাহা হবেনা। তাছাড়া অনেকের বাড়ীতে এ দুমাসে অনেক ঘি, হাঁস মোরগ জমেছে। এগুলো সৎকার করতে হবে। অনেকের অনেক মানত জমা হয়ে আছে। একবার মানৎ করে ফেললে হুজুরের হাতে না পৌঁছা পর্যন্ত আল্লার আরশে কোন দোয়াই পৌঁছবে না। উত্তর পাড়ার নোয়াজ আলীর ছাগল শেয়ালে নিয়ে যায়। দিনে দুপুরে। আরও যেগুলো আছে সেগুলো রক্ষা করতে গিয়ে হুজুরের নামে বড় খাশিটা মানত করেছে। এমনি আরও অনেকের অনেক মানত। হুজুর তো আর ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগি নিয়ে যেতে পারেন না। তাই বিক্রি করে টাকাটা দিয়ে দিলেও সওয়াবের কোন কমতি হবেনা। মানতের উদ্দেশ্যও সফল হবে।

ছেলে মেয়েরা রওয়ানা দিয়েছে। লাইন ধরে। কয়েকজন বয়স্ক লোক তাদের তালিম দিচ্ছে কিভাবে হাঁটতে হবে। সামনে দশ বার জন বয়স্ক লোক, মাঝখানে বাচ্চারা, পেছনের দিকে আট দশ জন বৃদ্ব। সবশেষে পাল্কি। খালি পাল্কি যাচ্ছে হুজুরকে বহন করে আনার জন্য। এখান থেকে পাঁচ মাইল। এতদূর পথ হুজুর পদব্রজে তাঁর স্থুল দেহখানা

নিয়ে আসতে পারবেননা। তাই এই ব্যবস্থা। আর ছোট ছোট বাচ্চারা এই পাঁচ মাইল হেটে একবার যাবে, আবার হুজুরকে নিশান উড়িয়ে নিয়ে আসবে। তাদের কোন কষ্ট হবেনা। তাছাড়া হুজুরের সেবায় যে যত কষ্ট করবে তার তত ছওয়াব বেশি হবে।

আমি আর দাঁড়ালামনা। আমগাছের পেছন দিয়ে সোজা বাড়ীর ভেতর চলে গেলাম। বাড়ীতে ঢুকতেই মা আদেশ করলেন পীর ছাবকে আনতে যেতে হবে। আমি অসুস্থতার ভান করে কোনরকমে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলাম।

ঘর থেকে জানালা দিয়ে দেখলাম পুকুরের দক্ষিন পাড়ে বেশ কিছু লোক হুজুরের জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে। পুকুর পাড়ে আম গাছের নীচে হুজুরের জন্য চেয়ার রাখা হয়েছে একদিকে, আর একদিকে জাজিমের উপর ছফেদ বিছানা পাতা হয়েছে। বলা তো যায়না হুজুর শুয়ে বিশ্রাম নিবেন নাকি চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিবেন। এতদূর পথ পাল্কিতে বসে ক্লান্ত হয়ে আসবেন। এই আমগাছতলায় খোলা হাওয়ায় তিনি আগে বিশ্রাম নিবেন, তারপর বাংলাঘরে যাবেন। রাজকীয় খাদ্য খেয়ে ঘুমিয়ে শ্রান্তি দূর করবেন।

বিছানার পশ্চিমে মাদুর পাতা হয়েছে। নামাজের জন্য। ঘাসের উপর নামাজ পড়তে তার কষ্ট হবে। তাই একটা কাথা বিছিয়ে তার উপর নমাজের মোসলা দেয় হয়েছে।

নদীর ওপারে পাল্কি দেখা যাচ্ছে। তিনি আসছেন। সবাই উঠে দাড়িয়েছে। হুজুরের সন্মানার্থে। তিনি সব জান্তা। দূর থেকেও মানুষের মনের কথা জানতে পারেন। অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করতে পারেন। পুকুর পাড়ে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। এটা আন, ওটা আনতে হবে। জলচৌকি নেয়া হয়নি। তিনি এসে কিভাবে ওজু করবেন? তাই আমার উপর আদেশ হল জলচৌকি নিয়ে যাবার।

কিছুক্ষনের মধ্যেই পাল্কি এসে নামল পুকুর পারে। পাল্কির চারদিকে সকলে ভীর করে দাঁড়িয়েছে। পাল্কির দরজা খোলাই ছিল। দুজনে খুব তাজিমের সাথে, সাবধানে হুজুরকে বের করলেন। তিনি দাঁড়াতেই পায়ে হাত দিয়ে সালামের লাইন পড়ে গেল। ছেলে বুড়ো সকলে। যারা হুজুরের চেয়ে বয়সে অনেক বড় তারাও পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। হুজুরকে কদমবুসি করা মানে আল্লাহকে খুশি রাখা। আল্লাহ খুশি থাকা মানে পুলছেরাত পার হবার সেতু শক্ত হওয়া।

আছরের নামাজের সময় বয়ে যাচ্ছে। তাই তাড়াতাড়ি করে নামাজের ব্যবস্থা করা হল। অবশ্য আগে থেকেই করা ছিল। এখন হুজুর ওজু করবেন। জলচৌকিটা রাখা হল এক পাশে। নেয়াজ আলীর হাতে পানি ভর্তি বদনা। বারেকের হাতে একটা তোয়ালে। তিনি ধীর পায়ে এগিয়ে জলচৌকিতে বসলেন। নেয়াজ আলী বদনা থেকে পানি ঢালছে, বারেক তোয়ালে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এক বদনা শেষ হয়ে যাওয়ায় আর এক বদনা পানি আনতে হল। ওজু শেষ হতেই বারেক হুজুরের পা মুছে দিয়ে হুজুরের হাতে তোয়ালে দিল। হুজুর নিজে কষ্ট করে তাঁর মুখ এবং হাত মুছলেন।

নামাজ শেষ হতেই শুরু হল আব্দার। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে পানির গ্লাস হাতে। হুজুর একের পর এক সব কটিতেই ফু দিয়ে দিলেন। যার যত অসুখ বিসুখ সব সেরে যাবে এই পানি পড়ায়। বাড়ীতে কোন বালামুসিবত এলে এই পানি ছিটিয়ে দিলে আর কিছুই থাকবেনা। তাছাড়া হুজুর যতদিন আছেন ততদিন কোন বিপদআপদ আসবেনা এখানে। যে সব বালা মুসিবত পানিতে সারেনা সেগুলোর জন্য তাবিজ নিলেই হয়। তাবিজের ফজিলত অনেক।

তাবিজের শ্রেনী আছে। জরুরী কাজের জন্য নিলে তার হাদিয়া (ফি) বেশি। হাদিয়া নির্ভর করে কি ধরনের কাজ, কতদিনে তার ফজিলত (ফল) আশা করে এসব কিছুর উপর। হুজুরের কাছে সব কাহিনী বলতে হয়, তারপর তিনি ঠিক করেন কি তাবিজ লাগবে এবং হাদিয়া কত।

তিনি এখন আস্তানা গাড়বেন মোল্লাবাড়ীতে। তারপর একে একে সব বাড়িতেই দাওয়াত কবুল করবেন। নিঃস্ব দিনমজুরও হুজুরকে এক বেলা দাওয়াত না করে পারেনা। পরকালে সুখ আশা করতে হলে হুজুরের খেদমত করতে হবে। সবচেয়ে বড় মুরগিটা হুজুরের জন্য রাখা হয়েছে। পোলাও কোরমা করার সামর্থ না থাকলেও ধার কর্জ করে পীরছাবকে এক বেলা দাওয়াত করতে হবে। তিনি মেহেরবানী করে দাওয়াত কবুল করে তসরিফ নিলেই হয়। তিনি দয়া করে সুখাদ্য ভক্ষন করে সকলকে কৃতার্থ করে যখন ফিরে আসেন তখন খালি হাতে আসেন না। পীরছাবকে খালি হাতে দেয়া মানে পরকাল খালি থাকা। তাই ঋণ করে হলেও হুজুরের হাতে নগদ টাকা দিতে হয়। এমনি একে একে সব বাড়ীতে পদধূলি দিয়ে এক সময় পকেট ভাড়ি করে ফিরে যান নিজ বাড়ীতে। যতদিন থাকেন ততদিন তাঁর চারপাশে ভীর করে থাকে মুরিদের দল। সব কাজ বাদ দিয়ে। বেহেসতের কাজে।

আমার ইচ্ছে হল একটা তাবিজ লই। হুজুরকে সব খুলে বলি। কিন্তু কি বলব! কাহিনী বলতে হবে যে! রানুর কোন কাহিনী নেই। কি বলে তাবিজ চাব! সারদা বাবুরও কোন কাহিনী নেই। তাছাড়া সারদা বাবু বিধর্মী। হুজুর কিছুতেই বিধর্মীর ভাল হোক সেরকম তাবিজ দেবেননা। আর দিলেও হাদিয়া যা লাগবে তা আমার দ্বারা যোগার করা সম্ভব নয়। ইচ্ছে হল আমিও একবার হুজুর হব, এমনি তাবিজ পানিপড়া দেব। তাবিজের কায়দাকানুনগুলো হুজুরের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। সব জেনে প্রথম তাবিজটা করব যাতে রানু চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসে। এমনি অদ্ভুদ কল্পনা করলাম এশা নামাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নমাজ কি পড়া হল তা আমার খেয়াল নেই।

-তের-

রাজনগরের জেলে পাড়ার সব জেলে চলে গেছে ওপারে। হঠাৎ করেই, রাতের আঁধারে। এখন এদিকে আর কোন জেলেই রইলনা। হরমোহনের জালের বাঁশগুলো এমনি দাঁড়িয়ে আছে। আগামী দিনে জাল পাতার অপেক্ষায়। কিন্তু হরমোহন আর কোনদিনই আসবে না জাল পাততে।

পুকুর পাড়ে আম গাছটার নীচে বসে এসব কথাই হচ্ছিল নাজুর সাথে। তার কাছ থেকে বেলেকের গল্প শুনছিলাম। নাজু বলল, জানস, জায়েদকে দেখছি নিতাই আর তার বউ মালতিরে লইয়া আগরতলায় সিনেমা দেখতে গেছে। একবারে সিনেমার নায়িকার মত সাইজ্জা গেছে মালতি।

তুই জানিস কি করে? জিজ্ঞেস করলাম।

এখন তো মাল কিনতে আগরতলা বা সেখেরকোট যাইতে অয়না। নিতাইর বাড়ীতেই এখন আড়ত। জায়েদ এখন ঐখানেই থাকে। রাস্তার কাছে যে দোকানডা, তার মাঝেই রাত্রে থাকে। খায় নিতাইর ঘরে। নিতাইর বাড়ীতে মাল স্টক কইরা রাখে। জায়েদ অনেক বড় মালদার অইয়া গেছে। মালতিরে দামি দামি শাড়ি কিনে দেয়। নিতাই যখন যা চায় তাই দেয়। ঐদিন দেখলাম অনেকগুলি মুরগী লইয়া গেছে মালতির লাইগ্যা।

তারপর বলল, আর একটা জিনিষ খেয়াল করছস? জায়েদ এখন কেমন দামি কাপড় পরে? একবারে সাহেব সাহেব অইয়া গেছে। এখন আর বিড়ি খায়না। চারমিনার সিগারেট টানে।

আমি বললাম, টাকা হলেই মানুষ বদলে যায়।

এর মাঝেই বাচ্চু এসে উপস্থিত হল। আমাদের কথার মাঝখানে শুরু করল, দুলাল ডাক্তার গেছেগা শুনছস? কেউ জানেনা কোন সময় গেল। এদিকে তার অনেক রুগী। সকালে ওষুধ আনতে গিয়া দেখে ঘরে অন্য লোক। বিনিময় কইরা আইছে তারা। দুলাল ডাক্তররে না পাইয়া এখন সবাই দৌড়াইতাছে নিশি ডাক্তরের কাছে। আগেই তো নিশি ডাক্তরের অনেক রুগী আছিল, এখন সকালে লাইন ধরলে সইন্ধা অইয়া যায় ঔষুদ আনতে।

অর্ধবৃত্তে বেশ কয়েকজন ডাক্তার আছেন। চন্ডিদ্বারের সুরেন্দ্র নথ বনিক আর মনমোহন বনিক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। আরও কিছু আছেন যারা কোন এক সময় ঔষধের দোকান দিয়েছিল। ঔষধ বিক্রি করে এখন তারা মস্ত ডাক্তার হয়ে গেছে। ঔষধের নম এবং কাম জেনে জরুরী অবস্থায় ডাক্তারের কাজ চালিয়ে যয়। এলোপ্যাথি ডাক্তার মাত্র দুজন। একজন জগন্নাথপুরের দুলাল ডাক্তার আর একজন নয়মুড়ার নিশি ডাক্তার। তাদের কি যোগ্যতা বা তারা কি পাশ কেউ জানেনা। তবে তাঁদের ঔষধে রুগী ভাল হয়ে যায়। নিশি ডাক্তারের গোলাপি মিক্সচার খায়নি এমন লোক অর্ধবৃত্তে নেই বললেই চলে। যে কোন রোগের জন্য নিশি ডাক্তারের সেই গোলাপি রংএর মিক্সার মোক্ষম কাজ করে। যেসব রোগ এই মিক্সচারে সারেন, তাদেরকে 'বড়' ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয়। বড় ডাক্তার বলতে যাদের ডাক্তারি পাশ করা উপাধি আছে তাদেরকে বোঝানো হয়। অর্ধবৃত্তে এমন বড় ডাক্তার ন থাকায় রুগি নিয়ে শহরে যেতে হয়। কাছাকাছি শহর দুটো। এদিকে ব্রাম্মনবাড়িয়া, ওদিকে আগরতলা। যাদের বাড়ী বর্ডারের কাছে তারা রুগি নিয়ে যায় আগরতলা। আর যাদের বাড়ী রেল লাইনের কাছাকাছি তারা নিয়ে যয় ব্রাম্মনবাড়ীয়য়। সেই দু ডাক্তারের একজন, দুলাল ডাক্তার রাতের আঁধারে হঠাৎ চলে গেলেন ওপারে। বাকী রইলেন একজন, নিশি ডাক্তার। অর্ধবৃত্তের একমাত্র চিকিৎসক। সবেধন নীলমনি।

বাচ্চু জিজ্ঞেস করল, হেই, তরে নাকি ই,পি, আর-এ ধরছিল?

হ, পাঁচটা টেকা নিয়া ছাইড়া দিল। কালকার লাভটা শালারা লইয়া গেল।

করিমরে ধরছিল গত পরশু। লগে আছিল এব্বি জামাই। দুইজনরে ধইরা নাওয়ে তুইলা ধলাই বিলের মাইঝে নিয়া গেল। তারার মাল খুব বেশি আছিলনা। টেকাও আছিল না। ই,পি,আর আগে টেখা চাইছিল। নাই বলায় মালের হিসাব কইরা দেখল মাল বেইচা ভাগ করলে দুই টেখা কইরাও পাইবনা। তাই শুরু করল তুলা ধোনা। আগে শুরু করল করিমরে। রুলডা দিয়া যখন ঠেংগে কয়েকটা বারি দিল, চিক্যাইর দিয়া করিম একবারে বেহুস। একটা ই,পি,আর যখন করিমের বুকের উপর উইঠ্যা পা ওদিয়া পারান শুরু করল, তখন এব্বি জামাই লাফ দিয়া পানিতে পইরা ডুব। অনেক দূর গিয়া ধান খেতের ভিতর ডুইক্কা গেল। আন্ধার রাইত আছিল। টর্চ দিয়া অনেক খুইজাও তারে পায় নাই। তারপর করিমরে লইয়া ওরা চইলা গেল।

এব্বি জামাই সারারাইত ঝিম ধইরা ধানখেতে পইরা রইল। এখন ত শেষ রাইতে ঠান্ডা পড়ে। সকালে শীতে কাপতে কাপতে বাড়ীত আইছে। তার বউ তার এ অবস্থা দেখে জিগাইল, আরে তোমার এ অবস্থা কি কইরা অইল?

দেখ অখন কথা কইও না, আগে কাপড় দেও। করিমরে যখন বাড়িডা দিল, তখন রাগে আমি লাফ দিয়া পানিত পইরা গেছি। অখন কাপর দেও।

তারপর বাচ্চু আরও বলল, আমারে ধরছিল কয়েক দিন আগে। জায়েদের কথা বললাম, ছাইড়া দিল। জায়েদ এখন সব ই পি আর হাত কইরা ফালাইছে। জায়েদের মাল কইলেই ছাইড়া দেয়। তার কথা কইয়া অনেকেই বাইচা গেছে। জায়েদের মাল এখন ঢাকা যায়, আর এদিকে আগরতলা। অনেক মালদার অইয়া গেছে।

তিনবার জায়েদের মাল এক্সিডেন্ট অইছে, তারপরও তার কিছু অয় নাই। সাহাপুরের এক্সিডেন্টটা নাকি তার দলের মানুষেই করছে। লাভ নিয়া কি একটা অইছিল। জায়েদ নিজে বেশি খাইছিল লাভ, আর ভাটির মানুষকে কম দিছিল। লাভ নিলেই আর কয় পয়সা নিত, এখন যে দশ হাজার টেখার মাল শেষ!

নাজু বলল, অনন্তপুরের এক্সিডেন্টও কম আছিলনা। দুইশ মন পাট আছিল। ঐডা কিন্তু তার দলের মানুষ করে নাই। আর এক বেলেইক্কা করছে। কারন জায়েদের মালের জন্য সে ইচ্ছামত লাভ করতে পারছিলনা। এমন এক্সিডেন্ট অইলে মানুষ বইসা যয়। মনে অয় তার ব্যবসা বাড়ছে। কত টেকা যে বানাইছে কে জানে!

মাল এক্সিডেন্ট মানে লুট হয়ে যাওয়া। যা আর কোনদিন পাবার সম্ভাবনা থাকেনা। কোন কোন এলাকা আছে, কিছু গ্রাম আছে যাদেরকে বেলেইক্কারা ভয় পায়। সে সব গ্রামের ভেতর দিয়ে গেলে লুট হয়ে যাবে। এই লুট হয়ে যাওয়াকেই এক্সিডেন্ট বলে। তবে সে গ্রামের শক্তিশালি কেউ দলে থাকলে এক্সিডেন্ট হয়না। আর প্রায় প্রতি গ্রামেই নামকরা কয়েকজন বেলেইক্যা থাকে।

বাচ্চু বলল, জায়েদ লেখাপড়া ছাইড়া ভালই করছে। নামকরা কারবারি অইয়া গেল। এখন একনামে সবাই চিনে তারে।

নাজু বলল, দেখিস আমিও একদিন তার চেয়ে বড় কারবারি হইতাছি।

-চৌদ্দ-

স্কুলের শেষ দিনগুলো নিয়ে সবাই ব্যস্ত। মেট্রিকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। সোলেমানের অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেছি। তার এবছর ষোড়শ বর্ষ। আর আমি যাচ্ছি এই প্রথম। প্রতিটা মিনিট এখন পরীক্ষার চিন্তা। এখন আর স্কুলে যেতে হয়না। ঘরের দরজা বন্ধ করে শুধু পড়া আর পড়া। সেদিন দুপুর বেলা। পাটিগণিতে আশা ছেড়ে দিয়ে জ্যামিতি মুখস্থ করছি। হঠাৎ বাইরে শুনি কে যেন বলছে, দাদা, আমি ত আইয়া পরছি। আর ফিরা যামু না। আমারে এইখানেই থাকনের ব্যবস্থা কইরা দেন।

বেরিয়ে এসে দেখি হরমোহন। ভাইয়া বলছে, তুই কি আর ফিরে যাবিনা?

না, কই যামু কন। ওখানে কোন বিল, গাঙ কিছু নাই। মাছ ধরুম কই? সবাই লেবারি করে। বাপদাদার পেশা ছাইড়া অখন লেবারি করতে অইব। এইডা আমি পারুম না। আপনেরা আমারে একটা ব্যবস্থা কইরা দেন। আমি সব ছাইড়া চইলা আইছি। এইডাই আমার দেশ। মনডা খুব কান্দে এই দেশটার লাইগ্যা। ঘুমাইলেও দেখি এইখানে জাল

বাইতাছি, আপনেরার লগে কথা কইতাছি। এই একটা বছর আমি ঘুমাইতে পারি নাই। আমার চোখে এই দেশটা খালি ভাসে। জাইগাও দেখি, ঘুমাইলেও দেখি। বাবারে অনেক বুজাইলাম, চল ফিরা যাই। এইখানে থাকন যাইবনা। ঐখানকার মানুষ সবই তো আমরার আপন। ফিরা গিয়া কইলে সবাই সাহায্য করব। বাবা কিছুই শুনলনা। তারপর কইলাম, তাইলে আমি গেলাম। তোমরা থাক। চইলা আইলাম। অখন আপনেরা কন, কি করতাম।

একে দুয়ে জমতে জমতে বেশ কয়েকজন জমা হয়ে গেল। সবাই আনন্দে লাফালাফি করছে। হরমোহন হঠাৎ করে হিরো হয়ে গেল। তার খাবারের জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করল। তার খাওয়ার জন্য কয়েক বাড়ীতে টানাটানি শুরু হল। সবাই চায় নিজেদের বাড়ীতে নিতে। এত দূর থেকে হরমোহন সব ছেড়ে দিয়ে, মা বাপ আত্মীয় ছেড়ে চলে এসেছে। এখন এপারের মানুষই তার পরম আত্মীয়।

গ্রামের সবাই বসল বৈঠকে। এখন হরমোহনের থাকা আর খাওয়ার ব্যবস্থা করা। লাল মিয়া বলল, আমি আমার উত্তরবাড়ীর দুই গন্ডা জায়গা দিয়া দিব। তাতে অনেকেই নারাজ হল। তাহলে আমরা যে বাদ পড়ে যাই। পরে সাব্যস্ত হল সকলেই চাঁদা দিবে। দুগন্ডা জায়গা হরমোহনের নামে কেনা হবে। আর জাল কিনতে টাকা যা লাগে তা সকলে মিলে কিনে দিবে। এখন তার একটা জাল হলেই হল। বাঁশ পাতাই আছে। শুধু জাল বেঁধে নেয়া। তার ঘর করতে সকলেই সাহায্য করবে। বাঁশ, ছন যা লাগে সকলেই দিতে প্রস্তুত। দুদিনের মাঝেই হরমোহনের ঘর হয়ে গেল। এক সপ্তাহের মাঝে তার নতুন জাল এসে গেল। হরমোহন আবার আগের জীবন ফিরে পেয়ে মহা খুশী।

পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসেছি। এখন হাতে অফুরন্ত সময়। যেখানে সেখানে বসে আড্ডা দেই। যথা ইচ্ছে তথা যাই। যখন ইচ্ছে তখন মাছ ধরতে যাই। সেদিন বিলে খালি হাতে মাছ ধরছিলাম। কোন হাতিয়ার নেই। সাথে একটা মাছ রাখার ডুলি মাত্র। মাছ ধরার এ আর এক মজা। বিলে নামলেই মাছ কাদার নীচে লুকোয়। যখন কাদার নীচে লুকোয় তখন পানির নীচে থেকে বাতাসের ছোট ছোট কণা উপরে উঠে আসে। সে জায়গায় হাত দিলেই মাছ পাওয়া যায়। ডুলি অর্ধেক ভরে উঠে আসছি এমন সময় উত্তরপাড়ার মালেক বলল, নিশি ডাক্তার ধরা পড়েছে।

ধরা পড়েছে বললেই বুঝতে হবে বেলেইক্কারা ই পি আর-এর হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু নিশি ডাক্তার ধরা পড়বে কেন? নিশি ডাক্তার তো বেলেক করেনা! তাহলে কি নিশি ডাক্তারও বেলেক শুরু করে দিল? পরে শুনলাম, ই পি আর-এর হাতে নয়, বেলেইক্কাদের হাতে ধরা পড়েছে। সবকিছু নিয়ে শেষ রাতে আগরতলার দিকে পাড়ি দিচ্ছিলেন। সে সময় মনিঅন্দের বেলেইক্কা সুন্দর আলী দেখে ফেলে। আর যায় কোথায়। সুন্দর আলী আরও লোকজন জড়ো করে নিশি ডাক্তারকে ধরে বাড়ী নিয়ে এসেছে। খবর পেয়ে অনেক মানুষ এসে ভীড় করেছে। সবাই বলছে 'আমরা আপনার সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। তবুও ওপারে যাবেননা।' যাদের পরের দিন গোলাপি মিক্সার নেবার কথা তারা বলল, আমরা তাহলে যাব কোথায়? অনেকের অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে, চোখের জল ফেলে নিশি ডাক্তার প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমি তোমাদের মাঝেই থাকব। আর কোনদিন ওপারে যাবার চিন্তা করবনা'।

-পনের-

হরমোহন জাল বায়না। সকালে কিছুক্ষণ জাল টানে। ডুলি থেকে ভাল ভাল মাছগুলো নিয়ে চলে যায় আক্কেল আলীর বাড়ীতে। বাকিগুলো পানিতে জিইয়ে রাখে। সেখানেই আড্ডা দেয়। আড্ডা দেবার তেমন কেউ নেই সে বাড়ীতে। আক্কেল আলীর যখন তখন অবস্থা। অনুফা এখন শাড়ী পরে। হরমোহনের সামনে আসেনা বড় একটা। হরমোহন একা বসে থাকে বাইরের ঘরে। আক্কেল আলী মাঝে মাঝে কাশি দিয়ে তার অস্তিত্ব জানান দেয়। সারাদিন একটা

লোক বসে থাকলে খাওয়ার সময় ডাকতে হয়। তাই খেতে বলে। বলার সাথে সাথেই হরমোহন বসে পড়ে। খেয়ে তামাক টানে। আক্কেল আলীর সাথে দু একটা কথা হয়।

ব্যাপারটা অনেকেরই চোখে পড়েছে। মফিজ মিয়া জিজ্ঞেস করল, কিরে, হরি, এখন তো মাছের পুরা মৌশুম। পানি আর মাছে সমান। তুই যে জাল ধরস না? টাকা বানাইবার এইটাইতো সময়।

হরি বলল, টেখা দিয়া কি অইব? দুই টানের মাছ বেচলেইতো আমার অইয়া যায়। বেশি দিয়া কি করমু?

কেন, জমা। ভবিষ্যতের লাইগা জমা কর।

কে খাইব?

কেন, বিয়া শাদি করবি না?

কে দিব আমার কাছে বিয়া?

তুই ক কোনখানে তর পছন্দ।

যদি অভয় দেন ত কই। রাগ করবেন না তো? মারবেন না তো?

ডরাইসনা। ক!

অনুফা!

আরে, অনুফা? তুই তো এখন আমারে একটা ভেজালে ফালাইয়া দিলি।

কোন ভেজাল নাই। আমারে মুসলমান কইরা ফালান। আইজই আমি মুসলমান হমু। চলেন কারি সাবের কাছে। আর ভাল্লাগেনা! কোন কাম করতেই মন চায়না। যদি আমারে দয়া করেন তয় আমার সব ঠিক অইয়া যাইব।

আবার বৈঠকে বসল গ্রামবাসী। এবার হরিকে গৃহদান নয়, উদ্দেশ্য গৃহচ্যুত করা। হরির এত বড় সাহস। হিন্দুর সাথে মুসলমানের বিয়ে! তাও আবার জাতে জেলে! কত বড় সাহস তার! বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো! দুধ দিয়ে সাপ পোষা আরকি! অনেকের অনেক মন্তব্য। কেউ বলে হরা এসেছে এই উদ্দেশ্য নিয়েই। তাকে গ্রামছাড়া করতে হবে। লাল মিয়া বলল, হরি যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে বিয়ে দিতে অসুবিধাটা কোথায়?

সাথে সাথে অনেক লোক এক সাথে চিৎকার করে উঠল। অনুফার একটা বংশ মর্যাদা আছে না? গরীব হয়েছে বলে কি পানিতে ফেলে দিতে হবে? একটা কৈবর্তের হাতে তুলে দিতে হবে? কয়েকজন একবারে মারমুখী হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সকলের অজান্তে গ্রামটা দুভাগ হয়ে গেল। কেউ বলল, হরি যদি কয়েক পুরুষ আগে মুসলমান হত, আর তার বংশের কেউ বিয়ে করতে চাইত তাহলে কি এমনি অবস্থার সৃষ্টি হত? আমাদের মাঝে হয়ত এমন কেউ

আছে যার পূর্বপুরুষ এ ধরনের কেউ ছিল। আজ তো আমাদের গায়ে তা লেখা নেই। অনেক রাত অবধি অনেক হৈচৈ করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি গ্রামবাসী।

হরির হিরোগিরি চলে গেছে। এখন তার টিকে থাকার প্রশ্ন নিয়ে টানাটানি। হরি কোথায় লুকিয়ে আছে। ভয়ে। গ্রামবাসী হরির বিপক্ষেই বেশি।

এ সব সমস্যার সমাধান অনুফাই করে দিল। একদিনেই সব দলাদলি মিটে গেল।

পরের দিন সকালে হরিকে খুঁজে বের করল লাল মিয়া। তার ভয় ভাঙ্গানোর জন্য সাথে নিয়ে গেল জালে। বলল, তুই যেমনি ছিলি তেমনি থাক। এখন জাল ফেল। মাছ ধর, বিক্রি করে টাকা বানা। বলে লাল মিয়া তার কাজে চলে গেল।

দুপুরে আবার এল হরিকে দেখতে। তাকে সাহস দিতে। লাল মিয়া বলল, আমি থাকতে তোকে কেউ কিছু বলতে পারবেনা। দরকার হলে আমি আমার ঘর একটা দিয়ে দিব। কোন চিন্তা করিস না।
ঠিক এমন সময় অনুফাদের পাশের বাড়ীর টুকু নামে একটা বছর ছয়েকের বাচ্চা এসে হরিকে বলল, আপনেরে খাইতে যাইতে কইছে অনুফাবু।

কথাটা শুনে লাল মিয়ার চোখগুলো খুশিতে নেচে উঠল।

অইছে! কাম অইয়া গেছে! হরি, তুই আর দেরী করিস না। এখনই যা।

ভয়ে হরির মুখ শুকিয়ে গেল। এত বড় সাহস হয় নাই হরির যে এত ঘটনার পর আবার খেতে যাবে। তাই লাল মিয়ার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

আমি তর পিছনে পিছনে যাইতাছি। ভয় কি? তরে দাওয়াত দিছে, যাবিনা কেন? নাইমা আয় জাল থাইকা! তর পিছনে, একটু দূরে দূরে থাকব আমি। চল।

জোর করে হরিকে নিয়ে গেল লাল মিয়া। হরি যখন আক্কেল আলীর বাড়ীতে ঢুকল, তখন লাল মিয়া আশে পাশের বাড়ীতে খবরটা দিল। বিশেষ করে যারা বিরোধিতা করেছিল তাদেরকে ডেকে দেখাল। সকলে দেখল, হরি খাওয়া দাওয়া শেষে জালের দিকে যাচ্ছে।

বিরোধী দলের নেতা আবু মেম্বার ছাড়ার পাত্র নন। সোজা গিয়ে অনুফাকে জিজ্ঞেস করল, অনুফা! তুই কি হইরারে খাইতে আইতে কইছিলি?

হ, কইছিলাম।

কেন কইছিলি? শুনস নাই কালকে সারা রাত কি অইল?

কিন্তু লোকটা রোজ এইখানে খায়, আইজ তো খাওনের সময় চইলা গেছে। না খাইয়া থাকব, তাই টুকুরে পাডাইছিলাম আনতে।

তারপর আরও অনেক জানা গেল। হরি এপারে না আসলে অনুফা ওপারে যেত কিনা তা নিয়ে গ্রামে অনেক কথা হয়ে গেল।

এখন হরমোহনের নাম হরমুজ খাঁ। হরমুজ খাঁ এখন বাড়াই গ্রামের সকলের আদরের জামাই।

-ষোল-

স্কুল ছেড়ে কলেজে। বাঁশঝাড়ের আবছা আঁধার থেকে একবারে আলো ঝলমলে রাজধানী শহরে। গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই শহরটাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। পারিনি। একটা নতুন জীবন। দলাদলি করতেই হবে। স্রোতের সাথে তাল দিতে গিয়ে নিজের অজান্তেই একটা দলের সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম। হৈচৈ দলাদলি মারামারি করে দিন কাটছে একটা রঙিন স্বপ্ন নিয়ে। সে স্বপ্ন হল আমি কবে কলেজ শেষ করে চাকুরি পাব, আর সেই চাকুরির টাকা পেয়ে রানুকে খুঁজতে বেরোব। কলেজে অনেক বন্ধু পেলাম। অনেকেই প্রেম করে। আমার কোন মেয়ের প্রতি চোখ যায়না। কাউকে আমার চোখে লাগেনা। আমার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য চলে গেছে ওপারে। সেই সৌন্দর্যের সামান্য ছিটেফুঁটোও রেখে যায়নি এপারে। যত সুন্দরী মেয়েই দেখিনা কেন, আমার মনে হয় রানুর কাছে কিছু নয়। বন্ধুরা মনে করল আমার মত সৎ ছেলে হয়না। পরীক্ষা পাশ করে এখন আমার সনদের প্রয়োজন। তা না হলে চাকুরী পাওয়া যাবেনা। চাকুরী না পেলে আমার বাজেট হবেনা। বাজেট না হলে রানুর সন্ধানে বের হতে পারবনা। যে নাম আমার অন্তরে ধিকি ধিকি জ্বলছে, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তার কাছে একবার যাব। তারপর কি হবে জানিনা।

কলেজে কোনদিন কোন রাজনীতি আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। পাড়াগাঁয়ের ছেলে রাজনীতির সাথে পরিচিত নই। তাই বন্ধুরা যখন রাজনীতি নিয়ে আলাপ করত আমি চুপ করে থাকতাম। তাছাড়া রানুর ধ্যানেই আমার সময় কাটত বেশি। তাই রাজনীতি আমাকে কাছে টানতে পারেনি। কিন্তু যেদিন থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হল সেদিন থেকেই যেন রাজনীতি আমার কাছে একটা বিশেষ বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আমার মনে হল পাকিস্তান নামে কোন রাষ্ট্র নেই। যা আছে তা দুটা রাষ্ট্র। একটা পূর্ব পাকিস্তান আর একটা পশ্চিম পাকিস্তান। এ দুদেশের সব কিছুই ভিন্ন। খাওয়া দাওয়া, কথা বার্তা, চালচলন এমন কি চেহারা স্বভাব। তবে কেন আমরা এক দেশ? কিভাবে আমরা এক দেশ? কোন্ যুক্তিতে? একটা দেশ থেকে আর একটা দেশ তিন হাজার মাইল দূরে। তারপরও আমার এক দেশ হলাম কিভাবে?

দেশের অস্থির অবস্থার মাঝে, বহু প্রতিক্ষীত সেই চাকুরী এসে ধরা দিল। পরীক্ষার পর পর স্টেট ব্যংকের নিয়োগপত্র পেয়ে গেলাম। কি আনন্দ! প্রথম বেতনটা পেয়েই কলকাতা। টাকা জিনিষটা আমার অনেক ক্ষতি করেছে। এবার দেখিয়ে দেব। রানুকে খুঁজে বের করবই। এতদিন টাকার জন্যই পারিনি। পৃথিবীতে যে যত টাকা রোজগার করেছে, সে তত উন্নতি করেছে। লেখাপড়া করারও উদ্দেশ্য টাকা কামাই করা। টাকা কামাই যদি না হয় তাহলে সে যত লেখাপড়াই করুক, জীবনে উন্নতি করেছে বলা যায়না। আমিও উন্নতি করব।

কর্মজীবনটা যেন হঠাৎ করেই মানুষের জীবনের পরিবর্তন এনে দেয়। নতুন নতুন দায়িত্ব এসে কখন ঘাড়ে চেপে বসে অনেক সময় অনুমান করা যায়না। বহুদিনের লালিত বাসনা, যা এক সময় মনে হয় জীবনের একমাত্র সুখের বস্তু,

To be continued...